পদ-চারণ

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

করকমলেষু—

গদ্যের কলমে-লেখা এই পদ্যগুলি যে আপনাকে উপহার দিতে সাহসী হয়েছি, তার কারণ, আমার বিশ্বাস, এগুলির ভিতর আর কিছু না থাক্, আছে—rhyme এবং সেই সঙ্গে কিঞ্চিৎ—reason.

এর প্রথমটি যে পদ্যের এবং দ্বিতীয়টি গদ্যের বিশেষ গুণ, এ সত্য আপনার কাছে অবিদিত নেই; সুতরাং আশাকরি আমার এ রচনা আপনার কাছে অনাদৃত হবে না।

তোমার নামেতে সবে মিছে কথা বলে,
সকলে জানিত যদি তোমার স্বরূপ,
কিছুই থাকিত নাকো এখন যেরূপ,—
তোমার নামেতে শুধু মিছে কথা চলে।

তোমারে খুঁজিয়া কেহ কোথাও না পায়,
বাহিরেতে নাহি মেলে তোমার দর্শন,
ভিতরেতে নাহি মেলে তোমার স্পর্শন,
শোনার অধিক জানা কেহই না চায়।

তোমার কাহিনী যত, সব রূপকথা,
তোমার ব্যাখ্যান করা জ্ঞানের মূর্খতা।

কেহই বলিতে নারে তুমি কিবা হও,
আলোকে থাকো না তুমি, না থাকো আঁধারে
কেহই বলিতে নারে তুমি কিবা নও,—
সবেতে [illegible] আছ ছায়ার আকারে ॥

১৯১১।

বিলাতে রবীন্দ্র

বিলাতের গেছে সে একদিন,
সুরে বাঁধা ছিল কবির বীণ,
দিগন্ত-প্রসারী ঝঙ্কার যার
আজিও কাঁপায় মনের তার।
সে সুর ভেঙেছে নূতন তন্ত্র,
এখন ক্যাঁকায় মানুষ-যন্ত্র,
দ্যুলোক পড়েছে ধোঁয়ার চাপা,
প্রকৃতির বাণী কালিতে ছাপা।

সহসা তুলেছে জাগায়ে প্রাণ,
পূব হতে এসে রবির গান,
ভারতী যাহার কলম ধরে'
নিতি নব গান রচনা করে,
লিখে রাখে নভে, জলে ও স্থলে,
রূপের বারতা সোণার জলে।

২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯১২।

কবিতা লেখা

এ যুগে কঠিন কবিতা লেখা,
কবিরা পায়না নিজের দেখা।
ঢাকা চাপা দিয়ে মনটি রাখি,
নিজ ধনে পড়ে নিজেই ফাঁকি
গলা চেপে গায় প্রেমের গান,
ভয়ে ভয়ে ছাড়ে প্রাণের তান
ভাব-মদে হলে নয়ন লাল,
দশে মিলে দেয় দুচোখো গাল

সুরুচি সুনীতি যুগল চেড়ি
কল্পনা-চরণে পরায় বেড়ি।
কবিতা কয়েদী, রাধার মত
দায়ে পড়ে করে গৃহিণী-ব্রত।
বাঁশী বাজে বনে বসন্ত রাগে,
জটিলা কুটিলা দুয়ারে জাগে।

২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯১২।

বন্ধুর প্রতি

লোকে বলে আছে তব কিঞ্চিৎ ক্ষ্যাপামি,
তথাপি আমার তুমি চির প্রিয়পাত্র।
তোমাতে আমাতে আছে মিল এইমাত্র—
ঠকিতে যদিও শিখি, শিখিনে ঠকামি।
জীবনে জ্যাঠামি আর সাহিত্যে ন্যাকামি
দেখে শুধু আমাদের জ্বলে যায় গাত্র,
কারো গুরু নই মোরা, প্রকৃতির ছাত্র,
আজো তাই কাঁচা আছি, শিখিনি পাকামি।

নীতি আর রাজনীতি আর ধর্ম্মনীতি,
যত গরু গুরু সেজে শিক্ষা দেয় নিতি।
প্রিয় শিষ্য কারো নই তুমি আর আমি,
আমাদের রোগ খোজা গুরুবাক্যে মানে,—
অথচ এদেশে সবে ঠিক মনে জানে,
যা-কিছু বোকামি নয় তাহাই ক্ষ্যাপামি।

২৭শে অক্টোবর, ১৯১২।

ফস্‌লে গুল্‌মে মস্ন্‌সে তোবা ?

বসন্ত এনেছে সঙ্গে পাঁচরঙা ফুল,
মখ্‌মলে কিংখাবে কেউ জবরজঙ,
ঠোটে গালে রঙ মেখে কেউ সাজে সঙ,—
বসন্তে বাসন্তী সুরা রঙেতে অতুল।

বসন্ত এনেছে সঙ্গে নানাগন্ধ ফুল,
কেউ তীব্র, কেউ মৃদু, কারো মিশ্র ঢঙ,
কেউ গুরু গন্ধগর্ব্বে একেবারে টঙ,—
মধুগন্ধে শীধু তুমি একেলা অতুল।

এস সখি স্ফটিকের সুরাপাত্র ভরি,
রূপরসগন্ধ-সার শুষে পান করি।
ওকি কথা ? কার ভয়ে হও তুমি ভীতু ?
সুরাপানে পাপ হবে ?—হোক্‌না তাইবা !
জীবনে কদিন আসে কুসুমের ঋতু ?
ফস্‌লে গুল্‌মে ছি ছি মস্ন্‌সে তোবা ?

২৭শে অক্টোবর, ১৯১২।

পূর্ণিমার খেয়াল

আজি সখি জ্বেলো'নাকো বিজুলির বাতি।
খুলে দাও সব দ্বার ঘর আজ হো'ক বার.
বিলায় আলোক-মেলা পূর্ণিমার রাতি।

ঝুলিছে আকাশে দেখ চাঁদের লণ্ঠন,
চারি পাশে তারে ঘিরি তারার দেয়ালগিরি,
গগনের গায়ে করে কিরণ বণ্টন।

ফোটে যেন লক্ষ ফুল স্বর্গ-বাগিচায়।
অথবা জরির বুটা সব সাচ্চা, নয় ঝুঁটা,
চন্দ্রের সভায় পাতা নীল গালিচায়।

নানা রূপ ধরে আজি বহুরূপী ইন্দু,
কথনো মন্দির-শিরে নেমে এসে ধীরে ধীরে,
বসে যেন আকারের শিরে চন্দ্রবিন্দু।

যামিনীর গণ্ড চুমি মহা অহঙ্কার!
আলো ফেলে তার চুলে কভু থাকে যেন ঝুলে
কামিনীর কর্ণভূষা স্বর্ণ অলঙ্কার।

পূর্ণিমার খেয়াল

সোনার কমল কভু, লুপ্ত যার বোঁটা।
উদাস আকাশ-ভালে রচে কভু স্ব-খেয়ালে,
চন্দনের পঙ্কে লিপ্ত কেশরের ফোঁটা।

চন্দ্রের রমণী যত কৃত্তিকা ভরণী,
শীধুপানে হেসে হেসে বিধু পানে আসে ভেসে,
জ্যোৎস্না-সাগরে বেয়ে সোনার তরণী।

শশি পশি সুরাপাত্রে হয়ে প্রতিবিম্ব,
লাল হয়ে মদ-রাগে অধীর চুম্বন মাগে
সুরাসিক্ত তব সখি অধরের বিম্ব।

আজিকার এ পর্ব্বের নায়ক শশাঙ্ক,
অভিনয় সারারাত করে' যাবে প্রতি পাত,
আনন্দের নাটকের সম্পূর্ণ দশাঙ্ক।

আমি আছি, তুমি আছ, আর আছে চন্দ্র।
পাত্রে ঢালো পোখরাজ কোলে তুলে এস্‌রাজ
সুরা আর সুরে মিশ্র গাও গীত মন্দ্র।

পূর্ণিমার খেয়াল

এ রাতে কে কা'র মানে শাসন বারণ ?
তুমি আমি নিশি ভোর   থাকিব নেশায় ভোর,
বারোমাস উপবাস, আজিকে পারণ !

মাঘ, ১৩১৯।

"THE BOOK OF TEA."

(শ্রীযুক্ত কাকুৎস ওকাকুরা—করকমলেষু)

জাপানে চা-পান ব্রত শিক্ষা দিল চীন,
মনেতে লেগেছে ছোপ তারি পীত রঙ।
চায়ের রঙীন নেশা স্বপ্নে ছায় দিন,—
ভারতের খেয়ালের কিন্তু জুদা ঢঙ।

গৈরিক আমরা জানি এক পাকা বর্ণ,
—ধূলার ধুসরে লিপ্ত হৃদয়ের রক্ত।
চা-পত্র হৃদয়মুক্ত তপ্ত দ্রব স্বর্ণ,
আত্মার সবর্ণ তাহে দেখে পীত ভক্ত।

হরিৎ পাতায় লেখে পীত শেষ বাণী,
পড়ি তাই আমাদের সুবর্ণে বিরাগ।
শরতে বসন্ত পূর্ণ জানিয়া জাপানী,
সৌন্দর্য্যের সীমা মানে মৃত্যুপূর্ব্ব রাগ।

৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯১২।

সনেট-সুন্দরী

বিগাঢ়যৌবনা তন্বী, আকারে বালিকা,
পরিণত দেহখানি আঁটসাঁট ক্ষুদ্র।
শিশির-ঋতুর স্নিগ্ধ মসৃণ রউদ্র
ঘনীভূত করে' গড়া স্বর্ণ পাঞ্চালিকা।
দৃঢ়বন্ধে সুসংযত করে কঞ্চুলিকা
পরিপূর্ণ হৃদয়ের অশান্ত সমুদ্র,
কলার শাসনে দান্ত মন তার রুদ্র,
মন্ত্রদেহ ষোড়শীর ধরেছে কালিকা।

সন্তর্পণে করি তার অঙ্গে হস্তক্ষেপ,
ভয় হয় অনিপুণ অঙ্গুলি-পরশে
ছিন্নভিন্ন হয়ে তার কাঁচুলির ডোর,
ব্যক্ত হয়ে পড়ে বুকে সংরুদ্ধ আক্ষেপ!
নির্গ্রন্থ হৃদয়মুক্ত উদ্বেলিত রসে,
সে রূপ মলিন করে নয়নের লোর।

অকাল বর্ষা

(ভীম ভাব)

বরষা এসেছে আজ সেজে বাজিকর,
মেঘের ধরিয়ে শিরে ঘন জটাজাল ।
অদ্ভুত মায়াবী ঋতু, রচি ইন্দ্রজাল,
চোখের আড়ালে রাখে গ্রীষ্মের ভাস্কর ।

সঘনে বাজায়, হয়ে বদ্ধপরিকর,
অম্বরে ডমরু, লক্ষ অলক্ষ্য বেতাল,
বিদ্যুৎ-নাগিনী যত, ত্যজিয়ে পাতাল,
অন্তরীক্ষে নাচে সবে, করে ধরি' কর ।

থেকে থেকে হেসে ওঠে, বিচিত্র বিশাল
গগনের কোণে কোণে রঙের মশাল ।

বরষা-পরশে দিবা রাত্রিরূপ ধরে,
আগুনে জলেতে ভুলি জাতি-বৈর আজ
খেলা করে আকাশের অন্ধকার ঘরে ;-
এ বাজির সব ভাল, বাদ দিয়ে বাজ !

১৫ই এপ্রিল, ১৯১৩।

বর্ষা

(কান্ত ভাব)

বরষা নিঃশ্বাস ফেলে করেছে মেদুর,
নিদাঘের আকাশের রজত দর্পণ।
ললিত গতিতে মেঘ করি প্রসর্পণ
হেলায় আচ্ছন্ন করে বৈশাখী রোদ্দুর।

বরষা মেঘের পাখা প্রসারি' সুদূর,
মধ্যাহ্নে কপিশ ছায়া করেছে অর্পণ।
তিরস্কৃত দিবাকর হয়ে সন্তর্পণ,
আকাশের অবকাশে ছড়ায় সিঁদুর।

তাপ-খিন্ন কুসুমেরা এবে মাথা তুলি',
নয়ন মেলিয়া দেখে অকাল গোধূলি।

শুভ্র পীত রক্তবর্ণ পরি চারু সাজ,
ক্লান্ত তনু রেখে কান্ত আকাশের কোলে,
ভর দিয়ে ক্ষীণবৃন্তে, মন্দ মন্দ দোলে
চাঁপা আর কৃষ্ণচূড়া আর গন্ধরাজ।

২০শে এপ্রিল, ১৯১৩।

সনেট-চতুষ্টয়

কবিতা।

কবিতা লিখেছি সখি, হয়েছে কসুর।
প্রথম মুস্কিল মেলা চরণে চরণ,
দ্বিতীয় মুস্কিল শেখা একেলে ধরণ,
তৃতীয় মুস্কিল দেখি পাঠক শ্বশুর!

কাব্যলোক জয় করে সুর কি অসুর,—
ভারতী যাহার যাচে চরণ শরণ।
কবিতা না করে যদি স্বয়ং বরণ,
টানাটানি তারে করা চরিত্র পশুর।

মিলিয়ে খিলিয়ে কথা আমি লিখি পদ্য,
লোকে বলে "ওত শুধু মিলনান্ত গদ্য"।

পদ্যে শুনি লেখা চাই মনো-ইতিহাস,—
মন কিন্তু দেখা দিয়ে লুকায় আবার।
ধরাছোঁয়া দেয় নাকো, করে পরিহাস,
ভাষায় পড়িলে ধরা, অমনি কাবার!

সনেট-চতুষ্টয়

কাব্যকলা।

কবিতার আছে কিছু রকমসকম।
গদ্যে লেখা এক কথা, পদ্যে স্বতন্তর,—
বাজে যাতে কাজে লাগে, আর অবান্তর,
ভাব ভাষা দুই চলে ধরিয়া পেখম।

ভাব ছোটে, যদি হয় হৃদয় জখম,
মনোরাগে ফাগ্ খেলে কবির অন্তর,
অগ্নি দেয় সুরু করে মনের যন্তর
পায়রার মত বকা বকম্ বকম্।

অথবা হৃদয় যদি অনলেতে পোড়ে,
ভাব ভাষা দুই গলে' নিজে হতে যোড়ে

পোড়া কিম্বা তোড়া নয় যাহার হৃদয়,
বুক আর মুখ যার আছে মেরামত,
কবিতা তাহারে নয় সহজে সদয়,—
শব্দ ধরে জব্দ করা তারি কেরামৎ!

আমার সনেট।

আমার সনেট নাকি নিরেট সুন্দরী ?
বর্ণের প্রলেপে দেহ কঠিন চিক্কণ,
চরণের আভরণে নাহিক নিক্কন,
বুকে নাই রাজযক্ষ্মা, উদরে উদরী।

শিখর-দশনা তন্বী, শ্যামা ক্ষামোদরী,
মসীকৃষ্ণ স্থির তার নির্ভীক ঈক্ষণ।
মুগ্ধ নেত্রে মূঢ়ে শুধু করে নিরীক্ষণ,—
এ রূপ পশেনা হৃদে নয়ন বিদরি'।

ভাষার সুসার আছে, নাই ভাব প্রাণ,
গোলাপের ছোপ্ আছে, নাই তার ঘ্রাণ।

আমি নাকি ভাবদেহ করি বিশ্লেষণ,
প্রাণহীন মূর্ত্তি গড়ি অঙ্গে অঙ্গ যুড়ে।
প্রতিমা দর্শনে শুধু, বিনা আশ্লেষণ,
পোরেনা এদের সাধ, গাত্র যায় পুড়ে!

আমার সমালোচক।

পরের লেখার এরা করে আলোচনা,
তার পূর্ব্বে জুড়ে দিয়ে সম উপসর্গ,
এরে দেয় জাহান্নমে, ওর হাতে স্বর্গ।
আমার বিচারপতি তুমি সুলোচনা।

কবিতার মূলে মম তব প্ররোচনা,
এ লেখা তোমারে তাই করি উৎসর্গ।
ভাল যদি নাহি লাগে, লেখায় বিসর্গ
তোমার আদেশে দিব, গৌরী গোরোচনা!

সনেটের গোণাগাঁথা ছত্র চতুর্দ্দশ,—
এ পাত্রে যায়না ঢালা একগঙ্গা রস॥

জানি মোর ভারতীর তনুর তনিমা,
না বধি রাবণ পদ্যে, কিম্বা রাজা কংস!
সাধনার ধন মোর ভাবের অনিমা,—
অর্থাৎ ভাষায় ধৃত মনের ভগ্নাংশ।

আষাঢ়, ১৩২১।

সনেট-সপ্তক

ইংলণ্ডে, কোন বিশেষ অবস্থায় পড়িয়া, জনৈক বঙ্গযুবকের হৃদয় এবং মন, সহসা যুগপৎ প্রণয় এবং কবিত্বরসে আপ্লুত হইয়া উঠে। তিনি তৎক্ষণাৎ একটি পকেট-বুকে পূর্ব্বোক্ত বাহ্যিক এবং মানসিক অবস্থার বিষয় নোট করিয়া রাখেন। তৎপরে সেই নোট অবলম্বনে স্বীয় মনোভাবের বর্ণনা করিয়া ইংরাজি ভাষায় ছয়টি সনেট রচনা করেন। আমি তাঁহার হস্তলিখিত পুঁথি হইতে এই সনেট কয়েকটি বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়াছি। সনেটগুলির প্রধান গুণ এই যে, তাহার ভাব কিম্বা ভাষায় কৃত্রিমতার লেশমাত্র নাই। এতদ্ব্যতীত, Ideality এবং Reality-র এরূপ অপূর্ব্ব মিশ্রণ, কাল্পনিক এবং বাস্তব জগতের এরূপ ওতপ্রোতভাবে একত্র সমাবেশ, আমি পূর্ব্বে কখনও অন্য কোন বঙ্গকবির রচনায় দেখি নাই। অথচ কবির হৃদয় যে খাঁটি বাঙালী হৃদয়, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার "বঙ্গভাষা এবং সাহিত্য" নামক বিখ্যাত গ্রন্থের পাতায় পাতায় এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, মধুর রসে বিগলিত হইয়া অবিরল অশ্রুমোচন করিতে বাঙালী কবি যেরূপ জানে, পৃথিবীর অন্য কোন কবি তাহার সিকির সিকিও জানে না। বুকের রক্ত জল হইয়া চক্ষু

হইতে নির্গত হওয়ার উপরেই যদি বাঙালী কবির কবিত্ব নির্ভর করে, তাহা হইলে আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, এই অপরিচিত যুবকটি বঙ্গদেশের একটি শ্রেষ্ঠ কবি। এই সনেটগুলি পাঠ করিবার সময় সহৃদয় পাঠক অন্তত দুচার ফোঁটাও চোখের জল ফেলিতে বাধ্য হইবেন। অনুবাদে মূলের ভাষার সৌন্দর্য্য রক্ষা করা যায় না, এবং সেই কারণে আমি অসম্ভবকে সম্ভব করিবার কোনরূপ বৃথাচেষ্টা করি নাই। যদি মাছি-মারা তরজমা নামক কোনরূপ পদার্থ থাকে তাহা হইলে আমার এ তরজমা তাই, অর্থাৎ আমি যতদূর সম্ভব অবিকল অনুবাদ করিয়াছি। প্রথম সনেটটি আমি কবির পকেট-বুকের নোট অবলম্বনে রচনা করিয়াছি, যাহা গদ্য আকারে ছিল তাহা পদ্য আকারে পরিণত করিয়াছি। আমি সেই নোট নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, তদ্দৃষ্টে ইংরাজি ভাষাজ্ঞ পাঠকমাত্রেই দেখিতে পাইবেন যে, অনুবাদস্থলে আমি নিজের কলম চালাই নাই।

Note :—

(1) Winding rivulet (2) Brook vocal (3) Rustic bridge (4) Railing (5) Beautiful lady leaning against (6) Playing violin (7) Lawn (8) Rabbit running about (9) Clear stream (10) Feeling heavenly bliss.

অনুবাদক]

প্রথম।

নীচেতে চলেছে জল আঁকিয়া বাঁকিয়া,
তরল আবেগ-ভরে ঝাঁকিয়া ঝাঁকিয়া ;
কানে শুনি তারি গান শুধু কুলুকুলু,
রসাবেশে হয়ে আসে চক্ষু ঢুলু ঢুলু।

উপরেতে ভাঙ্গা সাঁকো, হেরিনু যুবতী
রেলিঙেতে ভর দিয়ে আছে রূপবতী ;
আপন ভাবেতে ভোর বাজায় বেয়ালা,—
রূপে মোর ভরে গেল নয়ন-পেয়ালা।

নির্ম্মল নির্ঝর নীর, নাহি তাহে পঙ্ক,
রূপসী চাঁদের পারা শশ-হীন অঙ্ক,
শশক বেড়ায় ছুটে পেয়ে সমভূমি ;
চাঁদ যদি হাতে পাই একবার চুমি।

সে রূপ বর্ণনা করে বর্ণ নাই বর্গে,
না মরিয়া চলে গেনু একদম স্বর্গে।

দ্বিতীয়।

তব হস্তে যন্ত্র করে ভ্রমরগুঞ্জন ;
কভু ধ্বনি শুনি কাছে, কভু বহু দূরে,
কভু লম্ফে ঊর্দ্ধে 'ওঠে, কভু পড়ে ঘুরে,
জানিনে সে সুর আমি স্বর কি ব্যঞ্জন।

হৃদিতন্ত্রী কিন্তু মম করে ঝন্‌ঝন্‌ !
লেগেছে ভাবের নেশা বেয়ালার সুরে,
সঙ্গীতের মদ্যে হয়ে অতি চুর্‌চুরে,
তালে তালে নাচে মোর নয়ন-খঞ্জন।

সেই সঙ্গে নাচে মোর পরাণ-পুতুল
পাগলের পারা, হয়ে আনন্দে অতুল।

চোখের সুমুখে ভাসে দিবসের চাঁদ,
চাঁদির কিরণ দেয় চৌদিকে ছড়িয়ে,
ভেঙ্গে চুরে সব মোর হৃদয়ের বাঁধ,
কবিতার রস মনে পড়িছে গড়িয়ে।

তৃতীয়।

আমার বুকের কূপে একি তোলপাড় !
এতদিনে বুঝি মনে জাগে ভালবাসা !
এক বৃন্তে ফুটে ওঠে ভয় আর আশা,
এ জীবনে এল বুঝি প্রথম আষাঢ় !

কখনো আশার জ্বলে বেলোয়ারি ঝাড়,
কভু ঘিরে আসে মনে ভয়ের কুয়াশা ,
ও রূপ-মদিরা পিয়ে বাড়িছে পিপাসা,
হৃদয়-মাতাল খায় বুকেতে আছাড় !

কি রস ঢালিলে প্রাণে, হৃদয়ের রাজ্ঞী !
বর্ণনা করিতে নারি, নহি আমি বাগ্মী।

প্রেমসিন্ধু পানে এবে চলি ভরাপালে,
দোলা খায় অন্তরাত্মা, মুখে নাহি বাণী।
কি করি, বুদ্ধির হালে পায়নাকো পানি,
দুর্গা বলে ভেসে পড়ি, যা থাকে কপালে !

চতুর্থ।

ভাল তোমা বাসিবারে নাহিকো সাহস,
ভয়, পাছে লোকে বলে মোর আছে ছিট্—
গগনের তারা তুমি, আমি ক্ষুদ্র কীট্!
তোমারে হেরিয়ে শুধু হয়েছি বেহোঁস।

কিন্তু যদি হইতাম আমি খরগোস্,
এ দেহে পড়িত তব নয়নের দিঠ,
নিশ্চয় ছুটিতে তুমি মোর পিঠ পিঠ,
ধরা দিয়ে মানিতাম বিনাবাক্যে পোষ।

দূরে বসি এবে দেখি তব খোলা চুল,
তোমার আমার মাঝে আছে ভাঙা পুল।

মিলন-আশায় তাই হইয়ে হতাশ,
তোমার রূপের ঢেউ বসে বসে গুনি,
কানে কানে বলে মোরে নিষ্ঠুর বাতাস—
কভু তুমি ও-নারীর হবেনাকো "উনি"!

পঞ্চম।

পড়িতেছে আজ শুধু লুটিয়ে লুটিয়ে
আমার মনের পাখী বুকের বাসায়।
কোথা হতে জল এসে নয়নে নাসায়,
ফোয়ারার মত পড়ে ছুটিয়ে ছুটিয়ে।

মনের দুখের কালি ঘুঁটিয়ে ঘুঁটিয়ে
কবিতা আজিকে লিখি ইংরাজি ভাষায়,
পড়িবে তোমার চোখে ধরি এ আশায়,
কথায় ব্যথার ফুল ফুটিয়ে ফুটিয়ে।

কবি আমি হইয়াছি 'অবস্থায় পড়ে',
তরণী ছন্দেতে দোলে পড়িলেক ঝড়ে।

ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে মনের বাঁধন,
কবিতায় তাই আজি করি আপশোষ।
এখন আমার কাজ শুধুই কাঁদন,—
কোথা সেই বাহুলীন, কোথা খরগোস্!

ষষ্ঠ।

আশা ছিল একদিন আমি হেসে হেসে,
বলিব মনের কথা তব কানে কানে,
তোমার দেহের শাদা চুম্বকের টানে
বসিব তোমার আমি অতি কাছে ঘেঁসে!

সে সব প্রাণের সাধ আজ গেছে ভেসে
কোন্ দূর গগনেতে, কেবা তাহা জানে।
গা ঢেলে বিরহে চলি অকূলের পানে,
—আশার ডিঙার মোর গেছে তলা ফেঁসে!

মন আজ বলে শুধু "কোথা প্রাণসই,
ফোটে যার বেয়ালাতে সঙ্গীতের খই?"

এ বুকে লেগেছে তার বেয়ালার ছড়ি,
তারি টানে অবিরল চোখে আসে জল।
ভালবেসে পরদেশে এই হল ফল,
—রহিল বুকেতে চেন—চলে গেল ঘড়ি!

সপ্তম।

খুলে যদি দেখ মোর হৃদয়-ফলক,
দেখিবে সেথায় প্রিয়া, ঈষৎ হেলিয়ে,
চিত্রার্পিতা হয়ে আছে, কুন্তল এলিয়ে,
সুনীল কাঁচের চোখে না পড়ে পলক।

প্রতি অঙ্গ হতে ছুটে রঙের ঝলক,
মনের আঁধারে দেয় বিদ্যুৎ খেলিয়ে,
বুকের মাঝারে তাই উঠিছে ঠেলিয়ে
প্রাণের মধুর রসে প্রবল বলক!

যদিচ প্রিয়ার ছবি মনে আছে আঁকা,
প্রিয়া বিনে সব মোর লাগে ফাঁকা ফাঁকা

কতকাল র'ব বল শুধু স্মৃতি নিয়ে?
অশ্রুজলে যাক্ বুকে ছবি ধুয়ে মুছে।
অলীক সাদার মোহ যাক্ মনে ঘুচে—
করিব স্বদেশে ফিরে কালো মেয়ে বিয়ে!

আষাঢ়, ১৩২০।

বর্ষা

(ছড়া)

এ বুঝি আষাঢ় মাস,
তাই ছুটে' চারিপাশ,
শুধু করে হাঁসফাস
পূবের বাতাস।

কালো কালো মেঘগুলো
জলখেয়ে পেট ফুলো,
পুঁটুলি পাকিয়ে শুলো
জুড়িয়া আকাশ।

হাতির মতন ধড়
নাহি তাহে নড়চড়,
নাক ডাকে ঘড় ঘড়
চারিদিক ছেয়ে।

এত হ'ল অন্ধকার
দিবারাত্রি একাকার,
পাখী সব চীৎকার
করে ভয় খেয়ে।

বর্ষা

দু' হাত না চলে দৃষ্টি,
ধু'য়ে পুঁ'ছে সব সৃষ্টি
অবিশ্রাম ঝরে বৃষ্টি
ঝর ঝর ঝরে।

দেখে' ভয়ে কাঁপে বুক,
আকাশ ভেংচায় মুখ
বিদ্যুতের সব টুক
জিভ্ বার করে।

চিল খায় ঘুরপাক,
ডালে বসে' কাঁপে কাক,
আকাশেতে বাজে ঢাক
ড্যাঙ ড্যাঙ ড্যাঙ।

সারস মেলিয়া পাখা
নাচে হয়ে আঁকাবাঁকা,
ময়ূর ধরেছে কেকা,
গায় কোলা ব্যাঙ।

বর্ষা

হাঁস, রাজ আর পাতি,
খালে বিলে সার গাঁথি
ফুলিয়ে বুকের ছাতি
হেসে ভেসে চলে

ব্যাঙদের মক্‌মকি,
বিদ্যুতের চক্‌মকি
দেখেশুনে বক্‌ বকি
এক পায়ে টলে।

গাছেদের মাথা ছুঁয়ে
আকাশ পড়েছে নুয়ে
জল ঝরে চুঁয়ে চুঁয়ে
মেঘের চুলের।

শিউলি ভুঁয়েতে লুটে,
কদম উঠেছে ফুটে,
ভিজে গন্ধ আসে ছুটে
কেতকী ফুলের।

বর্ষা

ছেলে পিলে মহানন্দ
ঘরে ঘরে হ'য়ে বন্ধ
পরস্পরে করে দ্বন্দ্ব
মহা তাল ঠুকে।

পা ছড়িয়ে নারীকুল
উনুনে শুকোয় চুল,
ত্ব'নয়ন বাষ্পাকুল,
ধোঁয়া ঢুকে ঢুকে।

মাতিয়া বরষা-রসে,
ভাঙ্গা গলা মেজে ঘসে
কোন যুবা ভাঁজে কসে
সুরটমল্লার।

কেহবা মনের ঝোঁকে
কবিতা লিখিছে রোখে,
গেঁথে দিয়ে প্রতি শ্লোকে
কুমুদকহ্লার।

বর্ষা

বলি শুন, ওহে বর্ষা !
আবার যে হবে ফর্সা
এমন হয় না ভর্ষা—
না হয় না হোক্ ।

তোমার ঐ রঙ কালো,
তোমার ঐ রাঙা আলো,
তার বড় লাগে ভালো
যার আছে চোখ ।

৭ই জুলাই, ১৯১৩।

কৈফিয়ৎ

(Terza Rima ছন্দে)

শুনাবো নূতন ছন্দে মম ইতিহাস,
কেমনে হইনু আমি শেষকালে কবি।
আগে শুনে কথা, শেষে করো পরিহাস।

যৌবনে বাসনা ছিল, দুনিয়ার ছবি,
আঁকিতে উজ্জ্বল করে সাহিত্যের পত্রে,—
বর্ণের স্বর্ণের লাগি পূজিতাম রবি।

ফলাতে সঙ্কল্প ছিল মোর প্রতি ছত্রে,
আকাশের নীল আর অরুণের লাল,—
এ দুটি বিরোধী বর্ণ মিলিয়ে একত্রে।

দলিত-অঞ্জন কিম্বা আবির গুলাল
অথচ ছিলনা বেশি অন্তরের ঘটে—
এ কবি ছিলনা কভু বাণীর দুলাল।

তাইতে আঁকিতে ছবি কাব্য-চিত্রপটে,
বুঝিলাম শিক্ষা বিনা হইব নাকাল।
চলিনু শিখিতে বিদ্যা গুরুর নিকটে।

হেথায় হয়না কভু গুরুর আকাল!
পড়িনু কত-না-জানি বিজ্ঞান দর্শন,
ভক্ষণ করিনু শত কাব্যের মাকাল।

সে কথা পড়িলে মনে রোমের হর্ষণ
আজিও ভয়েতে হয় সর্ব্ব অঙ্গ জুড়ে,—
এ ভবসিন্ধুর সেই সৈকত-কর্ষণ!

বন্ধ হল গতিবিধি কল্পনায় উড়ে,
গড়িনু জ্ঞানেতে-ঘেরা শান্তির আলয়,—
সহসা পড়িল বালি সে শান্তির গুড়ে।

নেত্রপথে এসে দুটি সুবর্ণ বলয়
সোনার রঙেতে দিল দশদিক ছেয়ে,—
সুশাসিত মনোরাজ্যে ঘটিল প্রলয়!

কৈফিয়ৎ

বলা মিছে এ বিষয়ে বেশি এর চেয়ে,
ছন্দেতে যায় না পোরা মনের হাঁপানি,—
এ সত্য সহজে বোঝে দুনিয়ার মেয়ে।

ফলকথা, কালক্রমে ত্যজি বীণাপাণি,
ছাড়িনু হবার আশা সাহিত্যে অমর।
হেথায় বাঁচিতে কিন্তু চাই দানাপানি!

পূজাপাঠ ছেড়ে তাই, বাঁধিয়া কোমর,
সমাজের কর্ম্মক্ষেত্রে করিনু প্রবেশ,—
সুরু হল সেই হতে সংসার-সমর।

পরিনু সবারি মত সামাজিক বেশ,
কিন্তু তাহা বসিলনা স্বভাবের অঙ্গে।
সে বেশ-পরশে এল তন্দ্রার আবেশ।

কি ভাবে কাটিল দিন সংসারের রঙ্গে,
স্বেচ্ছায় কি অনিচ্ছায়, জানে হৃষিকেশ।
কর্ম্মক্ষেত্র ধর্ম্মক্ষেত্র এক নয় বঙ্গে।

কৈফিয়ৎ

এদিকে রূপালি হল মস্তকের কেশ,
সেই সঙ্গে ক্ষীণ হল আত্মার আলোক,—
হইল মনের দফা প্রায়শ নিকেশ।

দেখিলাম হতে গিয়ে সাংসারিক লোক,
বাহিরের লোভে শুধু হারিয়ে ভিতর,
চরিত্রে হইনু বৃদ্ধ, বুদ্ধিতে বালক!

এ সব লক্ষণ দেখে হইনু কাতর,—
না জানি কখন্ আসে বুজে চোখ কান,
সেই ভয়ে দূরে গেল ভাবনা ইতর।

হারানো প্রাণের ফের করিতে সন্ধান,
সভয়ে চলিনু ফিরে বাণীর ভবনে,
যেথায় উঠিছে চির আনন্দের গান।

আবার ফুটিল ফুল হৃদয়ের বনে,
সে দেশে প্রবেশি, গেল মনের আক্ষেপ,
করিলাম পদার্পণ দ্বিতীয় যৌবনে।

কৈফিয়ৎ

এদিকে সুমুখে হেরি সময় সংক্ষেপ,
রচিতে বসিনু আমি ছোটখাট তান,
বর্ণ সুর একাধারে করিয়া নিক্ষেপ।

আনিনু সংগ্রহ করি বিঘৎপ্রমাণ
ইতালির পিতলের ক্ষুদ্র কর্ণেট,
তিনটি চাবিতে যার খোলে রুদ্ধ প্রাণ।

এ হাতে মূরতি ধরে আজি যে সনেট,
কবিতা না হতে পারে, কিন্তু পাকা পদ্য,—
প্রকৃতি যাহার "জেঠ", আকৃতি "কনেঠ"।

অন্তরে যদিচ নাহি যৌবনের মদ্য,
রূপেতে সনেট কিন্তু নবীনা কিশোরী,
বারো কিম্বা তেরো নয়, পুরোপুরি 'চোদ্দ'!

আশ্বিন, ১৩২০।

পত্র

শ্রীযুক্ত "সাহিত্য" সম্পাদক মহাশয়—

সুকরকমলেষু

(১)

বলি শুন বন্ধুবর, ঘুণ-ধরা বাঁশে ভর
দেয়া তব মিছে।
জীবনের তিন ভাগ, তার সুর তার রাগ
পড়ে' আছে পিছে।
সিকি যাহা আছে বাকি, দিতে নাহি চাহি ফাঁকি,
—অথচ নাচার।
যার অর্থ আমি খুঁজি, ভাল করে' নাহি বুঝি—
কি করি প্রচার ?
এহেন লেখক নিয়ে, পত্রিকা চালাতে গিয়ে,
ঠেকে যাবে দায়ে।
কল্পনা কাম্বোজ-ঘোড়া, বয়েসে হয়েছে খোঁড়া,
চলে তিন পায়ে।
ভোঁতা হল পঞ্চবাণ, প্রেমের উজান বান
নাহি ডাকে মনে।

সমাজের পোষা পাখী, সমাজ খাঁচায় থাকি,
ভুলে গেছি বনে।
এখন দখিনে বায় শুধু মিষ্টি লাগে গায়,
হাড়েতে লাগে না।
মলয়ের মন্দ ফুঁয়ে হৃদয় গেলেও ছুঁয়ে,
হৃদয় জাগে না।
পাপিয়ার কলতান আজো শুনি পাতি কান,
করিনু স্বীকার।
অশরীরী তার গানে আজিকে আনে না প্রাণে
তরুণ বিকার।
বসন্তে কুসুম ফোটে, নিশ্চয় ভ্রমর ছোটে
তার গন্ধ পেয়ে।
মুখ দিয়ে ফুলে ফুলে. কি যে করে অলিকুলে,
দেখিনাকো চেয়ে।
আজিও পূর্ণিমা নিশি ঢেলে দেয় দিশি দিশি
কিরণ শীতল।

কিন্তু তার দিব্যবর্ণ পারে না করিতে স্বর্ণ
মর্ত্ত্যের পিতল।

(২)

কপালেতে ছিল লেখা, তাই আজ লিখি লেখা,
অবসর পেলে।
কথার নেশায় মাতি, কথায় কথায় গাঁথি,
স্মৃতি-বাতি জ্বেলে।
লেখাপড়া মোর পেশা লেখাপড়া মোর নেশা,
কাজ আর খেলা।
সেই কাজ, সেই খেলা, করিয়াছি অবহেলা,
যবে ছিল বেলা।
এখন চারিটি দিকে রঙ যবে হল ফিকে,
রচি গদ্যপদ্য।
তাহার পোনোরো আনা, সবাকারি আছে জানা,
মোটে নয় সদ্য।

যে কথা হয়েছে বলা, সেই কথা সেধে গলা,
বলি আরবার।
মনের পুরোণো মাল, মেজে ঘসে করি লাল,
করি কারবার।
হয়ত বা পূরোপূরি, না জেনে করেছি চুরি,
পর-মনোভাব।
অথবা জাওর কাটি, খেয়ে আমি পরিপাটী
সাহিত্যের জাব।

(৩)

শুনিতে আমার কথা কার হবে মাথা-ব্যথা,
ভাবিয়া না পাই।
মানুষে কাব্যের গায় আগুন পোয়াতে চায়,
—নাহি চায় ছাই।
আমি চাই সত্য বলি, সত্য মোরে যায় ছলি,
মিথ্যা রেখে হাতে।

পত্র

কাব্যে চলে মিছা কথা,— কাব্যের এ মিছে কথা
লেখা পাতে পাতে।
ভাবকে তরল করা ভাষাকে সরল করা
নয় সোজা কাজ।
মনকে উলঙ্গ করি, এত না সাহস ধরি,
সেটা জানি আজ।
তাইতে বাহিরে আনি, ঢেকে তার দেহখানি
বাক্য-কিঙখাবে।
বলি—হের পেশোয়াজ, হেন চারু কারুকাজ
আর কোথা পাবে ?
আঁটসাঁট ছন্দোবন্ধ দিয়ে রচি কটিবন্ধ
মোর কবিতার।
দেখিলে পরখ করি, দেখিবে হয় ত জরি
ঝুঁটো সবি তার।
কবি চাহে নব ধাঁচে মনের পুতুল নাচে,
সাহিত্য-আসরে।

বাহবা পরের কাছে নর্ত্তকীর মত যাচে,
প্রমোদ-বাসরে।
ভাষা ভাব এলো করা. কবিতাকে খেলো করা
হয় তাহে জানি।
তাই বলে শুধু রঙ্গ, কাব্যে করা অঙ্গভঙ্গ,
ভাল নাহি মানি।
হলে ভাবেতে ফতুর হই ভাষায় চতুর—
এটি নাহি ভুলি।
কেহ দেয় করতালি কেহ দেয় খর গালি,
কানে নাহি তুলি।

এবে চাই গলা খুলে, ছলাকলা গিয়ে ভুলে
সাদা কথা বলি।
ত্যজি সব অহঙ্কার, খুলি বস্ত্র অলঙ্কার,
রাজপথে চলি।

কিন্তু সে হবার নয়, চলিতে পাইগো ভয়
সেই পথ ধরে'।
সে পথের কোথা শেষ নাহি জানি সবিশেষ,—
না জানে অপরে।

যা না দেখি, যা না জানি, তাই নিয়ে হানাহানি,
গুরুতে গুরুতে।
সৃষ্টির আসল মানে, কেহ কিছু নাহি জানে,
শেখায় পুরুতে।
জলো ধর্ম্ম, জলো নীতি, বেচাকেনা হয় নিতি,
সাহিত্য-বাজারে।
তত্ত্ব, তথ্য, তন্ত্র, মন্ত্র, জন্ম দেয় মুদ্রাযন্ত্র
হাজারে হাজারে।
হয় জ্ঞানী কাটা ঘুড়ি, নয় দেয় হামাগুড়ি,
ভুঁয়ে মুখ গুঁজে।
মুখে বলে "আবি আবি", অন্ধকারে খায় খাবি,
ভয়ে চোখ বুজে।

অথবা টানিয়ে কল্কি বলে বিশ্ব মহাভেল্কি,
জ্ঞানে যাবে উড়ে।
এদিকে কান্নার রোল, উঠিতেছে অবিরল,
দশ দিক জুড়ে।

মানবের অশ্রুবারি, যাহে না মুছাতে পারি,
সেই জ্ঞান ফাঁকি।
দর্শন বিজ্ঞান তাই, উড়িয়ে কথার ছাই,
কানা করে আঁখি।

তাই কথা বড় বড় একত্র করিতে জড়,
ভাল নাহি বাসি।
নাহি লাগে কারও কাজে, বড় কথা বড় বাজে,
নয় বড় বাসি।

ঢের ভাল তার চেয়ে চলে যাওয়া গান গেয়ে
আপনার মনে।
পলে পলে যাহা ফুটে', দলে দলে যায় টুটে,
হৃদয়ের বনে।

(৫)

মানুষেতে কিবা চায়, কেন করে হায় হায়,
কি তার অভাব ?
কেবা জানে, কেবা বলে, —এই মাত্র বলা চলে
এ তার স্বভাব।
রমণী ধরিলে ক্রোড়ে, সব বুক নাহি জোড়ে,
ফাঁক থেকে যায়।
শূন্য মনে বুঝাইতে, শূন্য হিয়া বুঁজাইতে,
আনে দেবতায়।
সে শুধু অনন্ত ধোঁয়া, নাহি দেয় ধরা-ছোঁয়া
নাহি যায় সরি।
সেই ভয়, সেই আশা, নাহি কোন জানা-ভাষা
যাহে রাখি ধরি'।
অতৃপ্ত হৃদয় কাঁদে পড়িতে প্রেমের ফাঁদে
ফিরে বার বার।
এইমাত্র আমি জানি, এইমাত্র আমি মানি
জগতের সার।

"জানি মোরা খাঁটি সত্য, ছোট বড় গূঢ় তত্ত্ব,
সকল সৃষ্টির।"
বলে' যারা করে সোর, জানে তারা কত জোর
কথার বৃষ্টির।
আমি চাহি শুধু আলো, ভাল নাহি বাসি কালো,
অন্তরের ঘরে।
আর জানি এক খাঁটি, পায়ের নীচেতে মাটি
আছে সবে ধরে'।
মাটি আর আলো নিয়ে, দিতে চাই দুয়ে বিয়ে,
সসীমে অসীম।
যত কিছু লেখাপড়া, তার অর্থ শুধু গড়া
মাটির পিদীম।
আর নাহি জোটে মিল, হাতে লেগে আসে খিল
চলে না কলম।
মস্তিষ্ক কাতরে চায়, এড়াতে চিন্তার দায়,
ঘুমের মলম।

শ্রাবণ, ১৩২০।

দুয়ানি

প্রাণহীন কবিদের বীণার ঝঙ্কার।
বাণহীন ধনুকের ছিলার টঙ্কার॥

কেবল কথার রাজ্যে বিস্তারে প্রভাব।
ছোট ছোট হৃদয়ের বড় বড় ভাব॥

ডুব দিয়ে অন্তরের অতল সাগরে।
কেহ বা মুকুতা তোলে, কেহ ডুবে মরে॥

খুঁজোনাকো সৌন্দর্য্যের গোড়াকার অঙ্ক
ফুলের গাছের মূলে পাবে শুধু পঙ্ক॥

শ্রোতা বলে রাগ বাজে শুধু এক তারে।
তবে কেন বাজে তার সাজে ডান্ ধারে॥

কাঁদ যদি বসে উচ্চ হিমালয় শিরে।
প্রতি বিন্দু অশ্রু হবে হাস্যোজ্জ্বল হীরে॥

অয়স্কান্ত মহাকাশ মনের চুম্বক।
মন যার লোহা, তার সহজ কুম্ভক॥

দুয়ানি

দ্বারে এসে অবশেষে রাখ শ্রান্ত কায়া।
পড়েছে মুখেতে তাই কপাটের ছায়া॥

বহুকাল তরুতলে আছ ধ্যানে বসি'।
জাননা পড়েছে সব পাতাগুলি খসি'॥

যদিচ অনন্ত বটে সুমুখের পথ।
শেষের আশার বাষ্পে চলে মনোরথ॥

বিশ্বছন্দ গড়ি, দিয়ে পদে পদে যতি।
পদে পদে স্থিতি বিনা নাহি হয় গতি॥

পাও যদি খুঁজে কোথা অসীমের সীমা।
দেখিবে সেথায় আছে দাঁড়ায়ে প্রতিমা॥

৭ই অক্টোবর ১৯১৩।

বনফুল

পত্রপুটে এলে কোথা বনবাসী ফুল ?
অঙ্গরাগ হেরি তব সমুদ্রের নীল,
তোমার পরশে আছে মলয় অনিল,—
এ তো নহে কুঙ্কনের সাগরের কুল !
হিমের আলয়ে হেথা বড় অপ্রতুল
সুখস্পর্শ সমীরণ, তরল সলিল।
সুকুমার কুসুমের কি আছে দলিল
এত উৰ্দ্ধে উঠিবার, না হলে বাতুল ?
এ দেশে আকাশে ভাসে ধূসর কুয়াশা,
তারি মাঝে মাথা তোলে পর্ব্বতের শৃঙ্গ,
উজ্জ্বল কিরীটে যার হীরক তুষার।
ক্ষীণ প্রাণে ধরি কোন প্রস্ফুটিত আশা,
এসেছ এ পরদেশে, যেথা নাই ভৃঙ্গ ?—
বরফের বুকে নাহি তোমার সুসার !

হিমালয়—২৪ অক্টোবর ১৩১৯।

চেরি-পুষ্প

বসন্তের আগমনে আজো আছে দেরি,
পর্ব্বতের স্তরে স্তরে বিরাজে তুষার ;
চুরি করে' ফিকে রঙ গোলাপী উষার,
লাজমুখে ফুটিয়াছ ঝাঁকে ঝাঁকে চেরি !
পত্রহীন শাখাগুলি ফেলিয়াছ ঘেরি,
বর্ষিয়া তাহার অঙ্গে কুঙ্কুম আসার।
সে জানে, যে বোঝে অর্থ ফুলের ভাষার,
বসন্তের ঘোষণার তুমি রক্তভেরি !

মর্ম্মর-কঠিন-শুভ্র-তুষারের গায়ে
পড়েছে রূপের তব রঙীন আলোক,
পূর্ব্বরাগে লিপ্ত তব কর-পরশনে,
শিশিরে বসন্ত-স্মৃতি তুলেছে জাগায়ে।
রক্তিম আভায় যেন ভরিয়া ত্রিলোক
শোভিছে উমার মুখ শিব দরশনে।

দারজিলিং

ভাল তোমা বাসি যখন বলি

"ভাল তোমা বাসি" যখন বলি
তোমায় ছলি।
প্রেমের কলি,
মরমে আমার সরমে ভয়ে
ফোটেনা রক্ত কমল হয়ে।

"ভাল নাহি বাসি" যখন বলি
অপনা ছলি।
প্রেমের কলি,
ভয়ের বাধার আঁধার ঘরে
আশার বাতাসে জীবন ধরে।

ভাল তোমা আমি বাসি না বাসি,
কাছেতে আসি।
তোমার হাসি,
মনের কোণেতে প্রদীপ জ্বেলে
নিতি নব দেয় আলোক ঢেলে।

ভাল তোমা বাসি যখন বলি

তোমা ছেড়ে যবে দূরেতে আসি,
তোমার বাঁশি
আকাশে ভাসি,
করুণ সুরেতে ভোরে ও সাঁঝে
ব্যাথার মতন বুকেতে বাজে।

২৩ মার্চ্চ ১৯১৪

প্রেমের খেয়াল

শ্রীমান্ মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

কল্যাণীয়েষু—

প্রেমের দু'চার কবিতা লিখেছি
লিখিনি গান।
প্রেমের রাগের আলাপ শিখেছি
শিখিনি তান।
কত না শুনেছি প্রণয় কাহিনী,
কত না শুনেছি প্রেমের রাগিণী
পাতিয়া কান।
আপন মনের কখনো গাহিনি
কাঁপানো গান।

প্রেমের খেয়াল

প্রেমের খেয়াল সহজে মানেনা
তাল ও মান।
ছোটা বই আর নিয়ম জানেনা
ফুলের বাণ।
প্রেম নাহি মানে আচার বিচার,
গীত নহে তার, সোনার খাঁচার
পাখীর গান।
প্রেম জানেনাকো দুবেলা মিছার
করিতে ভান।

তূরিতে ভেরিতে কখনো বাজেনা
তরল তান।
পরীর শরীরে কখনো সাজেনা
জরীর থান।

প্রেমের খেয়াল

আছে যা লুকায়ে ভাষায় অন্তরে,
পার যদি দিতে মনের যন্তরে
হাল্‌কা টান,
তবে তা আসিবে সুরের মন্তরে
ধরিয়া প্রাণ।

থাকে না কবির সাজানো ভাষায়
ফুলের ঘ্রাণ।
পড়েনা কবির সাজানো পাশায়
মনের দান।
করো যদি তুমি আকাশ-ফুলের
করো যদি তুমি অনন্ত ভুলের
মদিরা পান।
তাহলে গাহিবে প্রাণের মূলের
রসের গান।

২২ মার্চ্চ ১৯১৪

দ্বিজেন্দ্রলাল

উদার আঁধার মাঝে বিদ্যুতের মত
উঠেছিল ফুটে তব ক্ষিপ্র তীব্র হাসি
ঘনঘোর মেঘে ঘেরা দিগন্ত উদ্ভাসি'।
দেখায়েছ বাহিরের উদারতা কত ॥

গভীর অরণ্য মাঝে ক্রন্দনের মত
উঠেছিল বেজে তব মন্ত্র—মন্দ্র বাঁশি
রন্ধ্রে রন্ধ্রে, সুরে সুরে বেদনা উচ্ছাসি'।
বুঝায়েছ অন্তরের গভীরতা কত ॥

সে আলো হারিয়ে গেছে এ দৃশ্য ভুবনে,
সে সুর চারিয়ে গেছে এ স্পৃশ্য পবনে।

যে আলো দিয়েছ তুমি সহাস্যে বিলায়ে,
যে সুরে দিয়েছ তুমি ছায়াময়ী কায়া,
মনের আকাশে কভু যাবে না মিলিয়ে—
রহিবে সেথায় চির, তার ধূপছায়া।

ভাদ্র ১৩২০

স্নেহ-লতা

স্বয়ংবরে বরিয়াছ তুমি বৈশ্বানরে
দেবতার আলিঙ্গন করি' অঙ্গীকার।
তব স্পর্শে উচ্ছ্বসিত জীবন্ত শিখার
আভায় তুলিছে আজ দেশ আলো ক'রে।

অপূর্ব্ব হোমাগ্নি জ্বালি বিবাহ বাসরে,
দিয়াছ আহুতি তাহে দেহ মল্লিকার।
"অনন্ত মরণ মাঝে জীবন বিকার"—
এসত্য কোথায় পেলে তব খেলা ঘরে ?

এ জগতে প্রাণ চায় সচ্ছন্দ বিকাশ ;
ফুলের ফুটিতে চাই উদার আকাশ।

দাস মোরা চিরবন্দী শাস্ত্র কারাগারে,
উন্মুক্ত আকাশ হেরি শুধু ভয় পাই।
জ্বেলেছ যে সত্য বহ্নি মিথ্যার মাঝারে
এ জড় সমাজ তাহে পুড়ে হোক ছাই।

ফাল্গুন, ১৩২০ সন

খেয়ালের জন্ম

(Terza Rima)

বাদশা ছিলেন এক পরম খেয়ালী,
বিলাসের অবতার জাতে আফ্‌গান।
দিনে তাঁর নিত্যদোল, রাত্তিরে দেয়ালী

জীবন তাঁহার ছিল শুধু নাচ গান,
—শাসন পালন রাজ্য করিতেন মন্ত্রী—
নর্ত্তকী দুবেলা দিত রূপের যোগান।

ঘিরে তাঁরে রেখেছিল শত শত যন্ত্রী,
কারো যন্ত্র রুদ্রবীণ কারো বা রবাব,—
স্পর্শে যার কেঁপে ওঠে হৃদয়ের তন্ত্রী।

কারো হাতে সপ্তস্বরা, যন্ত্রের নবাব,
ললিত গম্ভীর যার প্রসন্ন আওয়াজ,
মনের সুরের দেয় সুরেতে জবাব।

খেয়ালের জন্ম

সেকালে কেবল ছিল ধ্রুপদ রেওয়াজ,—
ছয় রাগ হয়ে হয়েছিল এত দরবারি,
একপা নড়িত নাকো বিনা পাখোয়াজ।

সঙ্গীতের ছোট বড় যত কারবারি,
বধিতে সুরের প্রাণ হল অগ্রসর,—
দুহাতে উঁচিয়ে ধরে তাল-তরবারি।

একদিন বাদশার জাঁকিয়ে আসর
বসেছে ইয়ার যত আমির ওমরা,
সাকীদের তাগিদের নাই অবসর।

দাঁড়ি গোঁফে কেশে বেশে হোমরা চোমরা
বড় বড় ওস্তাদেরা করে গুলতান।
হেন সভা নাহি দেখি আমরা তোমরা!

সহসা বিরক্ত স্বরে কহে সুলতান,—
"শুনে কান ঝালাপালা হয়েছে আমার,
রাত্তিরে বেহাগ শুধু, দিনে মূলতান!

ভাল আর নাহি লাগে ধ্রুপদ ধামার।
সুরু করে দাও যবে রাগের আলাপ,
ভুলে যাও শিষ্ট রীতি সময়ে থামার!

বিলম্বিত তালে যবে করগো বিলাপ,
মূর্চ্ছনা ঝিমিয়ে পড়ে মূর্চ্ছাকে জিনিয়ে,—
নয়ত দূনেতে বকো সুরের প্রলাপ।

যে গান দুবেলা গাও ইনিয়ে-বিনিয়ে,
সে গানে জমক আছে নাইকো চমক,
তাল হতে নার নিতে সুরকে ছিনিয়ে।

কারিগরি করে যবে লাগাও গমক,
তা শুনে আমার শুধু এই মনে হয়,
রাগ যেন রাগিনীকে দিতেছে ধমক!”

গুনীগণ পরস্পরে মুখ চেয়ে রয়,
বাদশার কথা শুনে সবে হতভম্ব।
হেন সাধ্য নাহি কারো দুটি কথা কয়।

খেয়ালের জন্ম

ভয়েতে সবার গায়ে ফুটিল কদম্ব,
আকাশ পড়িল যেন শিরেতে ভাঙ্গিয়া,
মুহূর্ত্তে হইল চূর্ণ ওস্তাদির দম্ভ।

নর্ত্তকীগণের মুখ উঠিল রাঙিয়া।
লাজে ভয়ে আন্দোলিত তাহাদের বুক,
স্তু হল ছিন্ন করি জরির আঙিয়া।

বাদশা কহিল পুনঃ রাঙা করি মুখ—
"নাহি কি হেথায় হেন সঙ্গীত নায়ক
যে পারে সৃজিতে গীতে নতুন কৌতুক?

সভা প্রান্তে ছিল বসে তরুণ গায়ক,
মদের নেশায় হয়ে একদম চুর,—
রূপেতে সাক্ষাৎ দেব কুসুম-সায়ক।

জড়িত কম্পিত স্বরে কহিল "হুজুর!
নাহি মানি দুনিয়ার কোনই বন্ধন,—
সার জানি দুনিয়ায় সুরা আর সুর।

অজানা সুরের এক অধীর স্পন্দন,
আজিকে হৃদয় মোর করিছে ব্যাকুল,
কি যেন বুকের দ্বারে করিছে ক্রন্দন।

বাঁধা রাগ গাঁথা তাল, এই দুই কুল
ছাপিয়ে ছোটাব আমি সঙ্গীতের বান,
উন্মত্ত উন্মুক্ত হবে সুর বিলকুল!"

এত বলি আরম্ভিল অর্থহীন গান,
তারায় চড়িয়ে সুর মহা চীৎকারি,
আকাশে উড়ায়ে দিল পাপিয়ার তান।

ধ্রুপদেরে পদে পদে দিয়া টিটকারি,
যুবকের কণ্ঠ হতে ঝলকে ঝলক,
উথলি উছলি পড়ে ঘন গিটকারি।

অবাক বাদশাজাদা না পড়ে পলক,
চোখের সুমুখে ভাসে সুরের চেহারা—
—প্রক্ষিপ্ত চরণ শূন্যে বিক্ষিপ্ত অলক!

খেয়ালের জন্ম

গায়ক বাদক ছিল সভায় যাহারা,
মনে মনে গণে সবে ঘটিল প্রলয়,—
কোথা সম্ কোথা ফাঁক ভেবে আত্মহারা!

শিহরিল নর্ত্তকীর কর কিশলয়,—
স্ফূরিত সুরেতে লভি কম্পিত দরদ,
শিঞ্জিত হইল ত্রস্ত মনির বলয়।

শিকল ছিঁড়িয়া সুর ভাঙ্গিয়া গারদ,
শূন্যে ছুটি আক্রমিল স্বর্গের দেওয়াল,
সে গান কৌতুকে শোনে তুম্বুরু নারদ।

জন্মিল সুরার তেজে সুরের খেয়াল
নেশায় বাদশা হাঁকে-"বাহবা বাহবা।"
ধ্রুপদীয়া কহে রেগে "ডাকিছে শেয়াল!"

২৯শে মে ১৯১৪

ত্রেপাটি

(Triolet)

ঊষা

ঊষা আসে অচল শিয়রে
তুষারেতে রাখিয়া চরণ।
স্পর্শে তার ভুবন শিহরে,
ঊষা হাসে অচল শিয়রে,
ধরে বুকে নীহারে শীকরে
সে হাসির কনক বরণ।
বসো সখি মনের শিয়রে
হিম-বুকে রাখিয়া চরণ।

তেপাটি

মধ্যাহ্ন

আকাশের মাটি-লেপা ঘরে
রবি এবে দেয় আলপনা।
দেখ সখি মেঘের উপরে
কত ছবি আঁকে রবি করে।
কত রঙে কত রূপ ধরে
ছবি যেন কবিকল্পনা।
বুক মোর আছে মেঘে ভরে
তাহে সখি দাও আলপনা।

সন্ধ্যা

দেখ সখি দিবা চলে যায়
লুটাইয়া আলোর অঞ্চল,
পিছে ফেলে অবাক নিশায়
দেখ সখি আলো চলে যায়।
বিশ্ব এবে আঁধারে মিশায়,
তাই বলে হয়ো না চঞ্চল।
বেলা গেলে সবে চলে যায়
গুটাইয়া আলোর অঞ্চল।

মধ্যরাত্রি

দেখ সখি আঁধারের পানে
চেয়ে আছে ছুটি শুভ্র তারা।
ছুটি শিখা বিকম্পিত প্রাণে
চেয়ে আছে স্থিররাত্রি পানে,
আধাঁরের রহস্যের টানে
ছুটি আলো হয়ে আত্মহারা।
রাখো সখি জ্বেলে মোর প্রাণে
আলোভরা ছুটি কালো তারা।

কাসিয়াং, ১০ অক্টোবর, ১৯১৪।

মিলন

জান সখি কেন ভালবাসি -
ওই তব ফোটা মুখখানি,
ওই তব চোখভরা হাসি
জান সখি কেন ভালবাসি ?
যবে আমি তোমা কাছে আসি,
ঠোঁটে মোর ফোটে দিব্যবাণী ।
তাই সখি আমি ভালবাসি
ওই তব গোটা মুখখানি ।

বিরহ

বলি তবে কেন চলে যাই,
শুনে যেন মরমে কেঁদনা।
তুঃখ দিতে, তুঃখ পেতে চাই,
তাই সখি তোমা ছেড়ে যাই।
আমি চাই সেই গান গাই,
সুরে যার উছলে বেদনা।
তাই যবে দূরে যেতে চাই,
সখি মোরে থাকিতে সেধনা।

কার্সিয়াং, ৩১ অক্টোবর, ১৯১৪।

ছোট কালীবাবু

(Triolet)

লোকে বলে আঁকা ছেলে ছোট কালীবাবু,
অপিচ বয়স তার আড়াই বছর।
কোঁচা ধরে চলে যবে, সেজে ফুলবাবু,
লোকে বলে বাঁকা ছেলে ছোট কালীবাবু।
দিনমান বকে যায়, হয় নাকো কাবু,
সুরে গায় তালে নাচে, হাসে চরাচর।
লোকে বলে পাকা ছেলে ছোট কালীবাবু,
যদিচ বয়েস তার আড়াই বছর।

১৮ই জুন' ৯১১৮।

সমালোচকের প্রতি

তোমাদের চড়া কথা শুনে
যদি হয় কাটিতে কলম,
লেখা হবে যথা লেখে ঘুণে,
তোমাদের কড়া কথা শুনে।
তার চেয়ে ভাল শতগুণে
দেয়া চির লেখায় অলম্‌,
তোমাদের পড়া কথা শুনে
যদি হয় কাটিতে কলম।

১লা নভেম্বর, ১৯১৪।

দোপাটি

(গাথা সপ্তশতী হইতে অনূদিত ।)

অদর্শনে প্রেম যায়, অতি দরশনে,
পরের কথায়, কিম্বা শুধু অকারণে ।

কালেতে দম্পতি-প্রেম এত গাঢ় করে,
যে মরে সে বাঁচে, আর যে বাঁচে সে মরে ।

সুখী যে, সে হেসে ভাল পরকে বাসায়,
নিজে ভালবেসে দুঃখী পরকে হাসায় ।

অকৃত্রিম প্রেম নাহি ইহলোক মাঝে ।
বিরহ কাহার হয়? হলে কেবা বাঁচে ?

সতৃষ্ণ নয়নে শুধু হেরেছি তোমায়,
স্বপনে করিলে পান তৃষ্ণা নাহি যায় ।

প্রভুত্ব গোপন করে' ব্যক্ত করে রতি,
নারীর বল্লভ সেই—বাকী সব পতি ।

দুঃখ দিয়ে সুখ দেয় চির প্রিয়জন,
নারীর হৃদয় যাচে হৃদয়-পীড়ন ।

দোপাটি

ধন্যা যে স্বপনে দেখে দয়িত আপন,
সে বিনে বিনিদ্র আমি, না দেখি স্বপন।

মণ্ডন আধেক সেরে যাও প্রিয় পাশে,
অসম্পূর্ণ সাজসজ্জা আগ্রহ প্রকাশে।

পতনের ভয়ে ম্লান উন্নতির সুখ,
অধঃপাত হবে জেনে স্তন কালীমুখ।

নিজের অন্তরে গাঁথা ধার সূক্ষ্ম সূতা,
ঝুলিছে বকুল সম ঊর্দ্ধপাদ্ লূতা।

চরণে পতিত পতি, পুত্র পৃষ্ঠে চড়ে,
গৃহিণীর গেল মান, হেসে উল্টে পড়ে।

বিরল অঙ্গুলিপুটে
ঊর্দ্ধনেত্রে পান্থকরে পান,
ক্ষীণ হতে ক্ষীণধারে
নারী তাহে করে বারিদান।

সিদ্ধি

এক হয় বসে থাকো, নয় যাও দূরে,
হয় থাকো চুপ করে, নয় গাও স্থরে।
হয় কেঁদে যাক্‌ দিন, নয় হেসে খেলে,
—দ্বিধার ধাঁধায় পড়ে আধা হয়ে গেলে।

কবিতায় কেহ করে জীবনের ভাষ্য,
কেহ বা প্রকাশে ছন্দে কল্পনার লাস্য,
জ্ঞানের ঔদাস্য কিম্বা প্রণয়ের দাস্য ;
এ-সব ছায়ার গায়ে আলো ফেলে হাস্য।

দুয়ানি

শীতেতে বিবর্ণা দিবা বিশীর্ণা দরিদ্রা,
হেসে ফেলে গায়ে মেখে রৌদ্রের হরিদ্রা

অস্পষ্ট মনের ভাবে কবিতার সৃষ্টি,
আগে চাও বাষ্প, যদি শেষে চাও বৃষ্টি।

লোকে বলে কথা কয়ে কিছুই না হয়,
আমি দেখি কথা ছাড়া কিছুই না রয়।

বাঙালী জাতির এটি পরম সৌভাগ্য,
হেন লোক নাই যার নাহি বৌ-ভাগ্য!

সনেট ✓

তব দেহশ্লিষ্ট শুক্ল বসন কাষায়,
গোপন করিতে নারে যৌবন-হিল্লোল।
সবাষ্প নয়ন-কোণে কটাক্ষ বিলোল
চকিতে বেকত করে, ভেদি কুয়াশায়,
হৃদয়-আকাশ-বহ্নি, আলোর ভাষায়।
শৈবালে আবৃত তব হৃদয়-পল্বল,
বৃথায় লুকাতে চায় প্রাণের কল্লোল,
নিরাশার ছদ্মবেশে ঢাকিয়া আশায়।

শ্রাবণে নদীর বক্ষ আবেগে চঞ্চল,
সংযত করে কি তারে সন্ধ্যার অঞ্চল ?
বায়ুর পরশ বিনে তাহার অন্তরে
অবাধ্য যৌবন তোলে রসের তরঙ্গ,
অস্তের গৈরিক-রক্ত বহির্বাস পরে'
ব্যক্ত করে হৃদয়ের উদয়ের রঙ্গ।

আশ্বিন, ১৩২৩।

খর্সাং

ঝুলে আছ গিরিপল্লী আকাশের গায়,
অটল পর্ব্বতপৃষ্ঠে করিয়া নির্ভর,
ধরে আছে শিরে ব্যোম হিমের কর্পর,
শুয়ে-পড়া বঙ্গভূমি চরণে লুটায়।
ক্ষণে তব হাসিমুখ, ক্ষণে মেঘে ছায়,
ঝরে বুকে সুখেদুঃখে অশ্রুর নির্ঝর।
কানে তব অহর্নিশি বনের মর্ম্মর
গাহিছে ঘুমের গান অস্ফুট ভাষায়।

তোমার কোলেতে বসি আমি ভালবাসি
হেরিতে বিচিত্রগতি মেঘ রাশি রাশি।
কখনো হাঁসের মত ভাসে নীলাকাশে,
পলকে আবার ধরে আকার ধূঁয়ার।
ভোরে সাঁঝে মাঝে মাঝে মেঘ-অবকাশে
চোখে পড়ে অলকার সোনার দুয়ার।

২ নভেম্বর, ১৯১৪।

তত্ত্বদর্শীর সিন্ধুদর্শন

সিন্ধু নহে শান্ত দান্ত স্তব্ধ অহঙ্কারে,
যোগী, কিন্তু মুনি নয়, সশব্দে হুঙ্কারে।
মহানদ মহানাদে বকে না প্রলাপ,
নাদস্বরে মহানন্দে করে শাস্ত্রালাপ।
সিন্ধুপ্রোক্ত গুহ্যশাস্ত্র, গূঢ় তার মানে,
বোঝে যারা শাস্ত্র-জ্ঞানী, মূঢ় কিবা জানে।
সমুদ্রের ভাষা শুনি খুলি অন্তঃকর্ণ,
ব্যঞ্জন তাহাতে নাই, শুধু স্বরবর্ণ।
ব্যক্ত নিয়ে ব্যস্ত যারা, বোঝে ভাষা স্পষ্ট,
পঞ্চভূতে বদ্ধ তারা, নাহি জানে ষষ্ঠ।
সিন্ধু কহে, বিশ্বগ্রন্থ উল্টো করে পড়ো,
তা'হলে চৈতন্য পাবে, সোজা দিকে জড়।
তত্ত্বজ্ঞানে মত্ত হয়ে, মায়া করি ধ্বংস,
অকূলেতে ভেসে যাই, হয়ে পরমহংস।

এপ্রিল, ১৯১১।

শরৎ

মেঘেরা গিয়েছে ভেসে দূর দ্বীপান্তর,
অবাধে পড়িছে ঝরে আলোক রবির।
আকাশ জুড়িয়া ওড়ে সোনার আবির,
ধরেছে সোনালি রঙ সবুজ প্রান্তর।

ক্ষীণপ্রাণ, সুকুমার, সলজ্জ, মন্থর,
বাতাস বহিয়া আনে স্পর্শ করবীর।
সোনার স্বপন আজ প্রকৃতি-কবির
এসেছে বাহিরে তার ত্যজিয়া অন্তর।

শরতের এ দিনের সুবর্ণের মায়া
না ঘুচায় অন্তরের চিরস্থির ছায়া।

আলোর সোণার পাতে মোড়া নভদেশ
ফুটিয়ে দেখায় তার অনন্ত নীলিমা।
এ বিশ্বের রহস্যের নিবিড় কালিমা
রঞ্জিয়াছে প্রকৃতির ওই নীল কেশ।

আশ্বিন, ১৩২৪।

সংসার

শক্তি নিয়ে মানুষের নিত্য পাড়াপাড়ি,
ধন নিয়ে মানুষের নিত্য কাড়াকাড়ি,
মন নিয়ে মানুষের নিত্য আড়াআড়ি,
প্রেম নিয়ে মানুষের নিত্য বাড়াবাড়ি।
ছুটিয়া চলেছে দিন বড় তাড়াতাড়ি,
না ফুরোতে সেই দিন, সব ছাড়াছাড়ি।

১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯১২।

কবির সাগর-সম্ভাষণ

হে সাগর! হে অর্ণব! জলধি মহান!
আমি শুনেছি তোমার গান,
আমি দেখেছি তোমার আলো।
শিয়রে সোনার দীপ তুমি যবে জ্বালো,
দিগঙ্গনাগণে দেখে সোনার স্বপন,
সে স্বপনে হয়ে যাই আমিও মগন।

প্রাণময়, গানময়, সিন্ধু তানময়!
তব ধ্যানে হয়েছি তন্ময়।
আমারে শেখাও তব ছড়া,
নিত্য নবছন্দে তব নিত্য ওঠাপড়া।
তব স্পর্শে খুলে গেছে হৃদয়-দুয়ার,
বহে যাক্ সেই পথে গীতের জোয়ার

কবির সাগর-সম্ভাষণ

কি রাগিনী গাহ তুমি, সিন্ধু কি ভৈরবী,
হে মুখর প্রকৃতির কবি ?
স্নিগ্ধঘোষ তোমার গমক
শুনিয়া এ প্রাণে মহা লেগেছে চমক।
কভু দাও ছাড়ি তান, কভুবা সম্বর,
তোমার সুরেতে আজি কাঁপিছে অম্বর।

হে অনাদি ! হে অনন্ত ! মহা আলোড়ন !
হে বিস্তার যোজন যোজন !
কি হুতাশে উঠিছ ফুঁসিয়া,
কি কথা কহিছ সদা রুষিয়া রুষিয়া ?
বহুভাষী বহুরূপী মহাপারাবার,
মন্ত্র দেহ মোর কানে মায়া সারাবার।

কবির সাগর-সম্ভাষণ

হে বিরাট ! হে উদার ! অসীম চঞ্চল !
ধরিয়াছি তোমার অঞ্চল।
দেহ মোরে তব স্নিগ্ধ কোল,
ক্রোড়ে লয়ে দাও মোরে অহর্নিশি দোল।
তরঙ্গ-অধরে দাও কপোল চুমিয়ে,
পড়ুক আকুল হৃদি অকূলে ঘুমিয়ে।

হে সুন্দর, হে চঞ্চল তরল সাগর !
তুমি মোর প্রাণের নাগর।
তব সনে আজি জলকেলি,
পরাও আমার অঙ্গে নীরাম্বরী চেলি।
তোমার বুকেতে শুয়ে হেরিব আকাশ,
ক্রমে ধীরে নিভে যাবে আলো ও বাতাস।

কবির সাগর-সম্ভাষণ

হে দুর্ব্বার ! হে দুর্দ্ধর্ষ উন্মাদ পাগল !
অট্টরোলে বাজাও মাদল ।
অট্ট হেসে করো চীৎকার,
ফুটুক অন্তরে মম সুখ-শীৎকার ।
ছুটুক আনন্দ-বন্যা উদ্‌ভ্রান্ত বিপুল,
ভেসে যাক্ সে বন্যায় মম প্রাণ-ফুল ।

এ বিশ্ব ডুবিয়া গেল আনন্দের বানে,
একদৃষ্টে চাহি সিন্ধুপানে ।
চেয়ে আছি নেত্রে নির্নিমেষ,
কি জানি কি বেদনার করেছে উন্মেষ,
উঠিছে মরমে বেজে যাহার "বিগল,"
করেছ পাগল সিন্ধু আমায় পাগল ।

কবির সাগর-সম্ভাষণ

হে সাগর, কর জোরে তুফান-গর্জ্জন,
আজি মোরে দিব বিসর্জ্জন
ওই তব ক্ষুব্ধ লুব্ধ জলে।
আশা আছে শান্তি পাব অতলের তলে;
ডুব দিয়ে কিন্তু হায়! আমি উঠি ভাসি,
জলের উপরে ফের ফেন—হাসি হাসি।